ওমর খৈয়াম

শ্যামশ্রী রায় কর্মকার

শ্রী সুরেশ চন্দ্র নন্দী প্রণীত ওমর খৈয়াম
ভূমিকা : স্যার যদুনাথ সরকার
প্রথম ছোঁয়া সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৪
প্রচ্ছদ : শোভন পাত্র
ছোঁয়া ২৭/১৭/১বি শেওড়াফুলি হুগলি ৭১২২২৩
তিনশো পঞ্চাশ টাকা

ওমর খৈয়াম এই নামটি শুনলেই কবিতার শরীরে যেন রবাব বেজে ওঠে। এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড অনূদিত *রুবাইয়াত অফ ওমর খৈয়াম* গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আগেই ঘটেছিল। সুরেশ চন্দ্র নন্দীর *ওমর খৈয়াম* ইতিহাস, কাব্য ও দর্শনমূলক আলোচনার মাধ্যমে খৈয়াম এবং তৎকালীন ইসলামের এক নতুনতর প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে।

> অবিমিশ্র রক্তের কোনো জাতি নাই ... সব সভ্যতাই একটি মিশ্র দ্রব্য। নানা স্থান, নানা যুগ হইতে ধার করা অংশ দ্বারা গঠিত। এইজন্য আরব সভ্যতা শুধু মুসলমানদের সম্পত্তি অথবা একটি জাতি বিশেষের গৌরবসামগ্রী নহে, ইহাতে জগতের সকলের স্বার্থ আছে।

স্যার যদুনাথ সরকারের এই মুখবন্ধটি শ্রী সুরেশ চন্দ্র নন্দী প্রণীত *ওমর খৈয়াম* গ্রন্থটিকে এক অন্য তাৎপর্য দেয়। 'ওমর' বলতে অধিকাংশ পাঠক বোঝেন সুরা, সাকি ও গোলাপ। অথচ খৈয়ামকে গভীরভাবে পাঠ করলে সেইসব কবিতার মধ্যে থেকে এক নিবিড় দর্শন উঠে আসে। খৈয়াম ছিলেন গভীর দার্শনিক, দক্ষ গণিতবিদ। ধর্ম ও সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডি পার হয়ে তাঁর উপলব্ধি এক অন্য উচ্চতায় আরোহণ করেছিল। বিশেষত, সুরেশ চন্দ্র নন্দী তাঁর লেখায় খৈয়ামের পাশাপাশি তাঁর দেশ, কাল, সভ্যতাকে অনায়াস দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার ইতিহাস হিসাবে এই গ্রন্থকে মান্যতা দিয়েছেন স্বয়ং যদুনাথ সরকার।

গ্রন্থটি বারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ খৈয়ামের জীবনের একেকটি সুবিস্তৃত পর্যায়কে তুলে ধরে। যেভাবে প্রথম পরিচ্ছেদটি শুরু হয়, খৈয়ামকে জানার

আগেই পাঠকের মনে একটি দৃঢ়প্রোথিত ভিত্তি নির্মাণ করেন লেখক। তৎকালীন পারস্য, খোরাসান, খোরাসানের রাজধানী নিশাপুর লেখকের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

> খোরাসানী ও নিশাপুরী কবিগণের কাব্যলীলাচাতুর্যেই পারস্যের প্রথম যুগের সাহিত্য অপূর্ব শোভাসম্পদে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। আব্বাস বংশীয় খলিফা এবং গজনী রাজবংশের রাজত্বকালীন সকল কবিই-মহাকবি ফিরদৌসী পর্যন্ত সকলেই খোরাসান-নিশাপুরের রম্য কুঞ্জকাননের বুলবুল ছিলেন। অন্ধকবি রূদকি, কীশাই, দকীকি এবং অন্যান্য স্বল্পখ্যাত কবিগণও নিশাপুরের অধিবাসী ছিলেন।

এই তথ্য আমাদের যত না বিস্মিত করে, তার চাইতে অনেক বেশি চমকিত হই অন্য আরেকটি উল্লেখে। কবি ফিরদৌসী এবং কবি আনওরিকে এই গ্রন্থে পয়গম্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ করতে হবে— তাঁরা প্রথমে কবি, পরে পয়গম্বর। লেখক পয়গম্বর সংক্রান্ত তথ্যটি ফুটনোটে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন।

> পয়গম্বর মহম্মদ বলিয়াছিলেন : যদিও আমার পর আর কোনা পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিবে না, তথাপি কবিদের মধ্যে তিনজন ভগবৎ প্রেরণায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পয়গম্বর রূপে জনগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধালাভ করিবে। ফিরদৌসী বীররস কাব্যে, আনওরি কসিদা এবং শেখ সাদি গজল রচনায় চির অমরত্ব লাভ করিবে।

বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে সুরেশ চন্দ্র নন্দী প্রদত্ত এই তথ্যটি এক অন্য আলোর মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। স্বভাব কঠোর রণপিপাসু আরব জাতি রূপান্তরের অন্যতম মূল কারণ হিসাবে লেখক খোরাসানের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠা করেন। 'খৈয়ামী' শব্দটির অর্থ তাঁবু নির্মাতা। বইটি থেকেই জানতে পারি, ওমর খৈয়ামের বাবা বস্ত্রাবাস নির্মাতা ছিলেন। অর্থাৎ ইউরোপে বা আমাদের দেশে যেভাবে পেশাভিত্তিক উপাধি প্রচলিত ছিল, পারস্যও তার ব্যতিক্রম নয়। যদিও লেখক এই গ্রন্থে একটি রুবাই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ওমর খৈয়াম পেশার ক্ষেত্রে পিতৃ পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি। যদিও কোনো কোনো লেখক মনে করতেন যে খৈয়াম তাঁর পৈতৃক ব্যাবসা অবলম্বন করেছিলেন। খৈয়ামের রুবাইটি এখানে তুলে দিলাম।

> সুদীর্ঘকাল জ্ঞানের তাঁবু সৃজন করি অমর খৈয়াম
> দগ্ধ হল, ধ্বংস হল,— লুপ্ত হল তাহার সুনাম
> জীবনসূত্র ছিন্ন হল, অদৃষ্টেরি অস্ত্রাঘাতে
> বৃথাই সে যে বিক্রি হল মৃত্যুরূপী দালাল হাতে

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'বিদ্যালয়ে ওমর ও তিনবন্ধুর গল্প'। মজার কথা হল, লেখক পরিচ্ছেদের একেবারে শেষে এসে বিষয়টির ওপরে আলোকপাত করেন। আমরা জানতে পারি, হাসনা বিন সব্বা এবং হাসান আলি ইবন ইশাক (নিজাম উল মুল্ক) কোনোদিনই সহপাঠী ছিলেন না। এই তিনজন সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাবলির পৌর্বাপর্য বিশ্লেষণ করেই লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

আবু আলি সিনা পারস্যে একটি প্রাতঃস্মরণীয় নাম। একাধারে চিন্তাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সুকবি আবু আলি সিনা পারস্যের চলমান প্রবাদ হয়ে উঠেছিলেন। ওমর খৈয়ামের ওপর আবু আলি সিনার প্রভাব এতটাই যে পারস্যের জনগণ খৈয়ামকে আবু আলি সিনার অবতার বলে অভিহিত করেন। সুরেশ চন্দ্র এই প্রসঙ্গে আবু আলি সিনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। খৈয়াম আবু আলি সিনার অসমাপ্ত বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করেন। মজার কথা হল, গুরু ও শিষ্য, উভয়ের কবিতাই পারস্যের মানুষকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। দুজনের কবিতাকেই মানুষ সুরা, সাকি ও সুরাপাত্রের মতো তুচ্ছ বিষয়ের কবিতা বলে মনে করেছিলেন।

ওমর মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান ছিলেন। তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার পথে অর্থাভাব এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেইসময় প্রায় মসীহার মতোই তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান আবু তাহির। ওমর ও আবু তাহিরের এই জুটিকে সুরেশ চন্দ্র ভার্জিল-ম্যাসিনাস জুটির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সুরেশ চন্দ্র মুসলিম জগতের উপর ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে এই গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন। বিশেষত খলিফা হারুন অল রশিদের (৭৩৮–৮০৮ খ্রিস্টাব্দ) সময় শিক্ষাগত আদান-প্রদানের উল্লেখ আছে। হিন্দু চিকিৎসক ও বিদ্বান পণ্ডিতগণ অনেকেই এই অঞ্চলে নিযুক্ত থেকেছেন। পরবর্তীকালে গ্রিসের প্রভাব আরব, ভারত ও গ্রিক ধারার সমন্বয়ে এক অনবদ্য মেলবন্ধনের জন্ম দিয়েছিল। বালখ নগরীর বার্মাক রাজবংশের পূর্বপুরুষেরা বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। খলিফা মামুন কৃত ভারতীয় ও গ্রিক গ্রন্থগুলি অনুবাদের উল্লেখ আছে সুরেশ চন্দ্রের লেখায়। আছে আরবীয় নবজাগরণের কথা। খোরাসান ও বাগদাদের রাজসভায় আরবি, ফারসি ও ভারতীয়দের উজ্জ্বল উপস্থিতির উল্লেখ খৈয়ামের বহুমুখী প্রতিভার প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়ায়। *ওমর খৈয়াম* গ্রন্থে খৈয়াম কেবলমাত্র একটি চরিত্র হয়ে থাকেন না। লেখকের উপস্থাপনায় আমজনতার দেশ, কাল, রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে উপস্থিত হন পাঠকের দরবারে। সুরেশ চন্দ্র আমাদের সেই ওমর-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

ওমর *আল জাবর ওয়াল মুকাবিলা* এর মতো একটি গণিতের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আল জাবর কথাটির অর্থ পুনঃস্থাপন বা রেস্টোরেশন, মুকাবিলা কথাটির অর্থ সমীকরণ বা ইকোয়েশন। যদিও আরব গণিতবিদগণ এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন না। এই আল জাবর থেকেই এলজেব্রা কথাটির উৎপত্তি। ওমরের *আল জাবর ওয়াল মুকাবিলা* প্রকাশিত হবার আগে নবম, দশম ও একাদশ খ্রিস্টাব্দের যে আরও তিনটি আল জাবরা প্রকাশিত হয়েছিল, এই তথ্যের উল্লেখ পাই সুরেশ চন্দ্রের এই গ্রন্থে। সুরেশ চন্দ্র বলেছেন, প্রথম খণ্ডের রচয়িতা মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খোয়ারেশমিকে আল জাবরার সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মান্যতা দেন স্বয়ং আর্যভট্ট এবং গ্রিক গণিতবিদ দারওফেনটাস। অষ্টম ও নবম

শতাব্দীতে ভারতীয় গণিতবিদগণ বীজগণিত এবং অঙ্ক গণিতে প্রাচীন মুসলিম গণিতবিদগণের গুরু ছিলেন বলে জানিয়েছেন সুরেশ চন্দ্র। মুসা পুত্র মোহাম্মদ ৮২০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় আদর্শেই তাঁর *আল জাবর ওয়াল মুকাবলা* রচনা করেন। সুরেশ চন্দ্র আমাদের অবহিত করেন যে, এই মোহাম্মদই পরবর্তীকালে ভারতীয় সংখ্যা বিজ্ঞানের সাহায্যে পাটিগণিত রচনা করেন। এই পর্যায়ে লেখক আরবের গণিত চর্চা নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। কোয়াড্রেটিক ইকোয়েশন এবং কিউবিক ইকুয়েশনের জন্ম এই আরবে। কেবলমাত্র জ্যামিতির সাহায্যেই যে ঘন সমীকরণ বা কোয়াড্রেটিক ইকোয়েশন সমাধান করা যায় ওমর খৈয়াম তা প্রমাণ করেছিলেন। তিনি এই নতুন প্রণালীর জনক এবং ওমরের এই প্রণালী পরবর্তীকালে পারস্যে এবং আরবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সাধারণ পাঠকের কাছে খৈয়াম সম্বন্ধীয় এই তথ্যগুলি তাঁর ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করে। ওমরের *আল জাবর ওয়াল মুকাবিলা বহু* শতাব্দী ধরে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে ওমর জ্যামিতি, পরিমিতি এবং ত্রিকোণমিতির উপসিদ্ধান্তগুলির টীকা রচনা করেন। আরবীয় জ্যামিতিকে তিনি প্রথম নির্দিষ্ট প্রণালীতে আবদ্ধ করেন। যে ওমর খৈয়ামকে আমরা রুবাইয়াতের রোমান্টিক কবি হিসেবে এতকাল জেনে এসেছি, সুরেশ চন্দ্রের এই অমূল্য গ্রন্থটির আলোয় তাঁকে নতুন করে চেনে পাঠক। ইউক্লিডের অপূর্ব প্রতিভাকেও তিনি অতিক্রম করেছিলেন। এমন গণিতবিদের প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে পাঠক হৃদয়।

মুসলিম পণ্ডিতগণ প্রথমে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে গণ্য করেননি। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের প্রভাব এর অন্যতম কারণ। অ্যারিস্টটলের মতানুসারে জ্যোতির্বিজ্ঞান কুসংস্কার ও কল্পনাকে ভিত্তি করে প্রসারলাভ করেছে। অল ফ্যারাবি, আবু আলি সিনা প্রমুখ দার্শনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার বিরোধী ছিলেন। একমাত্র দার্শনিক অল কিন্দিই জ্যোতির্বিজ্ঞানকে দর্শন শাস্ত্রের পরিপূরক বলে প্রচার করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে আবু আলি সিনা তাঁর পূর্বের বিশ্বাস থেকে সরে আসেন এবং ইস্পাহানে অবস্থানকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমে গ্রিক প্রভাবান্বিত হলেও পরে বিশেষত হিন্দু জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্তের (৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ) ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত অবলম্বনে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন ইব্রাহিম বিন হাবিব অল খাজারি এবং ইয়াকুব বিন তারিখ। আর্যভট্টের আর্যসিদ্ধান্ত অবলম্বনে গ্রহাদির গতিতালিকা বা টেবলস অফ প্ল্যানেটারি মুভমেন্ট প্রস্তুত করেন আবুল হাসান অল আহোয়াজি। খ্রিস্ট্রীয় নবম শতাব্দীতে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানে ওমর টল্মির প্রভাব লক্ষ করা যায়। একাদশ শতাব্দীতে তৎকালীন সুলতান মালিক শাহের নির্দেশে ওমর খৈয়াম চান্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌরমাস গণনার প্রচলন করেন এবং পারস্যের প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার করেন। খৈয়াম পঞ্জিকাটি সুলতান জালালউদ্দিন মালিক শাহের নামে উৎসর্গ করেন। এই পঞ্জিকাই ইতিহাসে *তারিখ-ই-জালালি* নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে সুরেশ চন্দ্র ওমরের সমসাময়িক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে নাতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন, যা পাঠককে তৎকালীন পারস্যের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে

সম্যক ধারণা দেবে। রোমক সম্রাট ত্রয়োদশ গ্রেগরির সময় খ্রিস্ট্রীয় পঞ্জিকার সংস্কার হয় (১৫৮২)। গ্রেগরিয় পঞ্জিকার তুলনায় জালালি পঞ্জিকা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর হওয়া সত্ত্বেও বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। সুলতানের উত্তরাধিকারীগণ জালালি অব্দ রদ করেন। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন, জালালি পঞ্জিকা গণনার সূক্ষ্মতা জুলিয়াস সিজার প্রবর্তিত পঞ্জিকার তুলনায় উৎকৃষ্ট বলে স্বীকার করেন। ওমর শুধুমাত্র গণিত, দর্শন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানেই পারদর্শী ছিলেন না। রসায়ন, প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁর গভীর জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন লেখক। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন ওমরের *মিনাজ-উল-হাকিম* (রসায়ন), *লওয়াজিম-উল-আমকিনা* (প্রাকৃত বিজ্ঞান) নামক দুটি গ্রন্থের কথা।

সেইসময় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে কোরান সমালোচক, কোরানের ভাষ্যকার বা কোরান পাঠক সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাভাজন বলে পরিগণিত হতেন। মুসলিম জগতে কোরান পাঠ এক উচ্চ শ্রেণির বিদ্যা বলে পরিচিত। এই বিদ্যাকে 'কিরয়ত' এবং পাঠককে 'ক্বারি' নামে অভিহিত করা হয়। কোরান সাতপ্রকার সুরে পাঠ করতে হয়। খৈয়াম সাত প্রকার সুরেই কোরান পাঠ করতে জানতেন এবং কোরানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক হিসাবে খ্যাতি লাভ করছিলেন। প্রচলিত সপ্তসুর ছাড়াও যে কোরান পাঠের আরও একটি বিশেষ সুর আছে, খৈয়াম সেই বিষয়েও জ্ঞাত ছিলেন বলে জানা যায়। সুরেশ চন্দ্র ওমরের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একথাও বলেছেন যে, কিছু ধর্মান্ধ মানুষ খৈয়ামের উদার মতবাদ সহ্য করতে না পেরে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাদের এই গোপন অভিসন্ধি জানতে পেরে খৈয়াম মক্কায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ওমর খৈয়াম রাজকবি ছিলেন না। তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যা তেমন বেশি না হওয়ায় বহুদিন পর্যন্ত ইরানে তাঁকে কবির সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে ইমামউদ্দিন খাতিম তাঁকে খোরাসানের কবি তালিকাভুক্ত করেন। রুবাই ছন্দের প্রাচীন নাম 'দু' বইতি। দুটি বয়েত বা চরণে সীমাবদ্ধ বলে ছন্দটির এইরকম নাম হয়েছিল। পরবর্তীকালে চারটি বয়েত বা চরণে লেখা হলে এর নাম হয় চহার বইতি। এটিই রুবাই নামে প্রসিদ্ধ হয়। সুরেশ চন্দ্র রুবাই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পারস্যের কবিতা এবং কাব্যরীতি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। বিশ্লেষণ করেছেন ওমরের কবিতা নিয়ে। ওমরের কবিতায় সুরেশ চন্দ্র যাকে রঙ্গ বলে চিহ্নিত করেছেন, আজকের কবিতা সমালোচকের চোখে তা তীক্ষ্ণ ধী এবং আবদ্ধ চিন্তার বিরুদ্ধে শ্লেষ বলে মনে হবে।

ওমর খৈয়াম গ্রন্থটিকে স্যার যদুনাথ সরকার 'মধ্যযুগের পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার ইতিহাস' বলে অভিহিত করেছেন। বইটি পাঠকের সামনে এমন এক দিগন্ত মেলে ধরে, এটি কেবল এক প্রখ্যাত কবির জীবন চর্চা হয়ে থাকে না। ইসলাম, পশ্চিম এশিয়া, এমনকী ভারতীয় গণিত বিষয়েও যথেষ্ট আলোকপাত করে। বইটির পাতায় পাতায় লেখকের গভীর এষণার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষায় এমন গ্রন্থ এখনও বিরল।